International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-II, September 2014, Page No. 21-25
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

নিম্নবর্গের কথকথার আখ্যানঃ প্রেক্ষিত ত্রিপুরার ছোটগল্প

অরূপা চক্রবর্তী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত

Abstract

Production system has two classes which always get priority are owner or exploiter class and worker or exploited class. With the evolution of civilization this things are yet remains in our society. That is why; their problems regarding those issues are needed to provide new demands for discussion. Such deprive people are also found in the society of Tripura. Writers of Tripura highlighted the topic of those kneaded and exploited people in their literature. They showed up with finger the actual wound in the society. In their short stories they not only showed the problem of Bengalis in Tripura. But, also the problem arises with the increase of Bengalis in Tripura and in consequence tribal people became refusing in their own land. The short stories of Tripura highlight the problem of kneaded and exploited daily wages people. Serving low-income people shrug, problems and their opposition figure are illustrates in kalipada Chakraborty's 'Samoyer Hat' story. The images of judicial fault, general low-income people to fight against exploitation are depicted by Kalipada Chakraborty in his "TIR" story. Description of horridness Problem due to Tripura's indigenous tribes and their Superstitious are raise by Bimal Chowdhury in his 'Jagoran' story. Struggling life of Common people and the image of shrug are depicted in the short story 'Grahan Kate Gele' by Manik Chakraborty. Short Stories of Tripura describe the real context of exploited people about their problems.

Key words: Writers of Tripura, Exploited people of Tripura, Indigenous Tribe, Economic condition, Social identity

বাঙলার সমাজ ব্যবস্থায় জাতিবর্ণ প্রথা হচ্ছে মূল কাঠামো। আর তার অর্থনৈতিক কাঠামো হল সামন্ত্রতান্ত্রিক। সেই জাতিগত ও সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে বঞ্চিত শ্রেণিকেই নিম্নবিত্ত শ্রেণি বলে অবহিত করা হয়। বাংলা সাহিত্যের আবির্ভাব লগ্ন থেকেই সেই নিম্নবর্গীয় শ্রেণি নানাভাবে বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় চিত্রিত হয়েছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ'-এ আমরা শবর, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি সমাজের অবহেলিত মানুষদের জীবন চিত্র পাই। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য, জীবনী সাহিত্য প্রভৃতিতে নানাভাবে নিম্নবিত্ত শ্রেণি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সচেতনভাবে নিম্নবিত্ত শ্রেণি বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় ব্রাত্যই রয়ে গেছে। শুধুমাত্র নিম্নবিত্তদের সাহিত্যের ও সংস্কৃতির আঙ্গিনায় এনে প্রাপ্য আদায়ের লক্ষ্যেই বাংলায় দলিত আন্দোলনের সূত্রপাত। বাস্তবিকপক্ষে বাংলায় দলিত সাহিত্য আন্দোলন একটি সর্ব্বভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির আন্দোলনের অংশ। দলিত সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনদের এটা সম্পূর্ণ অভিমত। দলিত সাহিত্যের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য বিষয়ে বলা যায়- 'দলিত সাহিত্য দলিতত্ব থেকে মুক্তির সাহিত্য, দলিত মানুষদের শত শত বৎসরের যন্ত্রনা, দুর্দশা, আশা আকাঙ্খার অকথিত কাহিনি ব্যক্ত করার সাহিত্য, সহানুভূতি নয়, সহানুভূতির সাহিত্য।'[১]

উৎপাদন ব্যবস্থায় দুটি শ্রেণি বরাবরই প্রধান্য পায়, মালিক বা শোষক শ্রেণি এবং শ্রমিক বা শোষিত শ্রেণি। সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই ব্যবস্থা এখনো সমাজে রয়েই গেছে। তাই এদের সমস্যাগুলি আবারও নতুন করে আলোচনার দাবী রাখে। ত্রিপুরার সমাজ ব্যবস্থায়ও সেই দলিত মানুষদের দেখা মেলে। ত্রিপুরার সৃজনধর্মী সাহিত্যিকেরা সেই দলিত ও নিপীড়িতের কথা তুলে ধরেছেন তাদের সাহিত্য সৃষ্টিতে। ত্রিপুরার ছোটগল্পে সেই চিত্র অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। তাঁরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন সমাজের প্রকৃত ক্ষতগুলিকে। ত্রিপুরায় শুধুমাত্র দলিত বাঙালিরা ছোটগল্পে উঠে আসেনি। বাঙালির আধিক্য বৃদ্ধির ফলে নিজভূমে পরবাসী হয়েছে ত্রিপুরার উপজাতি জনগণ। দলিত ও শোষিত সেই দৈন্যগ্রস্ত মানুষের সমস্যাগুলিও উঠে এসেছে ত্রিপুরার ছোটগল্পকারদের লেখনীতে।

শহরের নিম্নবিত্ত মানুষের অসহায়তা, সমস্যা এবং তাদের প্রতিবাদের চিত্র ফুটে উঠেছে কালিপদ চক্রবর্তীর 'সময়ের হাত' গল্পে। ত্রিপুরার বিশিষ্ট গল্পকার কালিপদ চক্রবর্তী ষাটের দশকের একেবারে শুরুতেই লিখতে শুরু করেন। তিনি একটি বিশেষ রাজনৈতিক বোধে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ভীষ্মদেব বলেছেন- 'যে বোধে কালিপদ মিছিলে যান, যে চেতনায় তিনি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সচেষ্ট, যে বিশ্বাসে সংগঠনের একনিষ্ঠ কর্মী, যে শ্রদ্ধায় ছাত্রকে কিছু দিতে চান- ঠিকই একই বোধ,

চেতনা, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে ও নিষ্ঠায় তিনি লেখেন।'[২] লেখক মার্কসবাদী চিন্তায় দীক্ষিত ছিলেন ও উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে ত্রিপুরায় আসার ফলে অনেক চরম বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি তিনি হয়েছিলেন। তাঁর এই রচনায় ঐ সমস্যার যথার্থ রূপায়ন লক্ষ্য করা যায়।

'সময়ের হাত' গল্পে লেখক শহরের নিম্নবিত্ত পরিবারের চিত্র এঁকেছেন। দরিদ্র পরিবারের চিত্র এঁকেছেন। দরিদ্র পরিবারের প্রতিটি দিনই জীবন সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। ঘরের একমাত্র আলোর সম্বল কেরোসিন আনাকে কেন্দ্র করে পরিবারের প্রতিটি মানুষের মধ্যে যেন একটা অস্পষ্ট টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে। অবিনাশের অনুভূতিই গল্পের মূল বিষয়বস্তু। অবিনাশ উপলব্দি করছে ধীরে তার সুন্দর সংসার কিভাবে এতো বিচ্ছিন্নতা ও দারিদ্রের ফলে অশান্তির পরিবেশ চলছে। তাই অবিনাশের কাছে- 'লাইন লাগিয়ে তেল আনতে যাওয়া যুদ্ধে যাওয়ার মতই মনে হয় তার।'[৩] প্রতিদিন তাদের সংসারে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এখানে সংসারের মেয়েরা বাইরে বেরিয়েছে সংসারের নিত্য প্রয়োজন মেটাতে। সংসারের কেন্দ্রমূলে নারীর অবস্থান। এই গল্পে মা বিনতি ও মেয়ে অর্চনারই সংসারের জন্য বেশি চিন্তা করতে হয়, কিন্তু তার ভাইদের মধ্যে তেমন কোন দেখা যায় না। বিনতি স্বামী অবিনাশকে কেরোসিন আনতে বলতেও ভয় পায়। কারণ অবিনাশকে সংসারের জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। অবিনাশ মনে মনে চিন্তা করে যে দায়িত্ব নিয়ে সে সংসার শুরু করেছিল তা প্রতিদিন কেমন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। এই কেরোসিনের লাইন তার কাছে জীবন যুদ্ধের মতো মনে হয়। সংসারে কর্তা হিসাবে তার দায়িত্ব আছে। তাই বিধ্বস্ত শরীরেও অবিনাশকে বেরিয়ে যেতে হয়।

অবিনাশের বিনতিকে দেখে মনে হয় বিনতি যেন দিন দিন বদলে যাচ্ছে। আগে বিনতির আচরণ অনেক কমনীয় ছিল। জীবনযুদ্ধে দলিত হতে হতে তার চেহারা, স্বভাব, পাল্টে গেছে মৃদু হাসি, সুন্দর কথাবার্তা সময় যেন তাকে আস্তে আস্তে বদলে দিচ্ছে। এখন কঠিন রুঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে তার মনে হয়-'প্রতিটি কথায় বিনতি ঠেস দিয়ে কথা বলে, অবজ্ঞা অথবা সোজাসুজি ব্যঙ্গের হাসি হেসে বিনতি এখন তার পৌরুষকে উত্তেজিত করতে চায়।'[৪] মেয়েকে অনেক কষ্টের মধ্যেও বিনতি বিয়ে দিতে চায়। 'বিনতির চোখ জ্বলে, কখনও কাঁদে, ভেঙ্গে চুরে বিকৃত হয়ে যায় মুখটা।'[৫] ছেলেদের জন্যও বিনতির চিন্তার শেষ নেই। এখানে নিম্নবিত্ত পরিবারে আর্থিক দৈন্যতায় সম্পর্কের উত্থান-পতনকে লেখক অসামান্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। আর্থিক দৈন্যতায় তাদের আচার আচরণে আসে রুক্ষতা। পরিবারের চিন্তা অবিনাশকে অস্থির করে তোলে। মনের দিক থেকেও সে ক্রমশ দূর্বল হয়ে যাচ্ছে। অবিনাশের জীবন সংগ্রামের সমস্ত বিষয়গুলি লেখক চিড়ে চিড়ে বিশ্লেষণ করেছেন। 'তার ক্লান্তি, তার অসহায় নিরাপত্তাহীনতা তার সুখ, দুঃখ, অভাব, অনটন, এ সবই কেমন উপরি উপরি মনে হয়।'[৬] জীবনের গতি নষ্ট হয়ে তার মধ্যে বিরক্তি ও অপ্রসন্নতা তৈরি হচ্চে। অবিনাশের বড়ার টুকরো অংশ খাওয়ার মধ্য দিয়ে সমাজের নিচতলার মানুষের অবস্থানকে লেখক তুলে ধরেছেন। গরিবের জায়গা নেই। যতকষ্ট সে করুক সামনে আরেকজন তার জায়গা কেড়ে নেয়, সবক্ষেত্রে এই পরাজয় অবিনাশের মনে অস্থিরতার সৃষ্টি করে। সমাজের শোষণে তার প্রতিক্রিয়া কোন পরিবর্তন আনতে পারে না।

বিচার ব্যবস্থার ত্রুটির চিত্র, অসম লড়াই-এ সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষের শোষণ ও বঞ্চনার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কালিপদ চক্রবর্তী তাঁর 'তীর' গল্পে। এ গল্পে সমাজের নিচু তলার গরিব কৃষক ষষ্ঠীচরণের কথাই উঠে এসেছে। নিচুতলার মানুষের প্রতি প্রশাসনের মনোভাব এখানে চিত্রিত হয়েছে। প্রশাসন নানাভাবে তাদের ন্যায় বিচার পাবার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়। গল্পের প্রধান চরিত্র ষষ্ঠীচরণ, তার ডান হাতের মাঝ বরাবর একটা তীর গেঁথে রয়েছে। ফালি এক টুকরো কাপড় তার পড়নে, যা সভ্য জগতের সঙ্গে মানানসই নয়। সে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হাকিমের কাছে যাবে ন্যায় বিচারের আশায়। প্রমাণ দেখাতে ষষ্ঠী বারটা মাইল ছুটে আসে তীরটা হাতে রেখেই। লেখক এখানে একেবারে বাস্তবের কথা তুলে ধরেছেন। অনেক কষ্টে সে চা বাগানের নিচের লুঙ্গার জমি তৈরি করেছে। কিন্তু জমির উপর এখন চা বাগানের ম্যানাজারের নজর। তাদের মধ্যে সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে তীর মারা হয় ষষ্ঠীকে। তাই উপযুক্ত প্রমাণ সহ বিচারের আশায় এ তীরটা গাঁথা অবস্থায় দারোগার কাছে যায়। কিন্তু দেখা যায় ম্যানেজার উল্টো তার বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে তাকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেয়। আদতে ষষ্ঠী দাঙ্গাবাজ নয়। সে জন্মচাষা। জমির প্রতি তার প্রীতি রয়েছে। কারণ দিনরাত এক করে সে জমি তৈরি করেছে।

১৯৭৫ সালে দেশে জরুরী অবস্থা চলাকালীন এই গল্পটি রচিত হয়। দেশের প্রশাসন তখন এমন পর্যায়ে এসেছিল যে সাধারণ মানুষের অভিযোগের পরিণতি তখন এমনই হত। ষষ্ঠী চরিত্রটিকে লেখক এমনভাবে এঁকেছেন যে সেটি সমস্ত দিক দিয়েই প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। দারোগাবাবু ইতিপূর্বে ষষ্ঠীকে প্রমাণ আনতে বলেছিল, কিন্তু এবার প্রমাণ এনেও তার কোন লাভ হয় না। কারণ দারোগা বাবু ম্যানেজারের লোক। তাই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে একসময় তীরটা খুলে ফেলে। এখানে মানবিকতার চরম পরিণতিকে গল্পকার তুলে ধরেছেন। জমিটা সে নিজে তৈরি করেছে, তাই হাকিম হয়তো তাকেই জমিটা দিয়ে দেবে। কিন্তু তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় না। হাকিম এজলাসে নেই একথা শুনার পর তার যন্ত্রণা মুহূর্তেই তীব্রতর হতে থাকে। তারপর দেখা যায়- 'উর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন, কোমরে একফালি ন্যাকড়া মাত্র বেড় দেওয়া, টকটকে লাল চোখে বিশাল দেহ ষষ্ঠীচরণ জবুথবু হয়ে হাকিমের অপেক্ষায় আদালত ঘরের বারান্দায় বসে থাকে। যেন জন্মাবধি সে অমনি বসে আছে এবং থাকবে।'[৭] এখানে ষষ্ঠী সমস্ত শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। যারা চিরদিন এভাবে ন্যায় বিচারের আশায় বসে থাকে। ষষ্ঠীর প্রতিপক্ষ শক্তিশালী, তাই তাদের অভিযোগ জোড়ালও। তাই গল্প শেষে এক নির্মম বাস্তবের ছবি- 'শ্রীপুর চা বাগানের ম্যানেজানের উপর হামলা করার অপরাধে গ্রেপ্তার হওয়া ষষ্ঠীচরণ মাতাল অথবা শিশুর মত এলোমেলো পা ফেলে আদালত ঘরের বারান্দা থেকে নেমে আসে।'[৮] এখানে শক্তিশালীরা কিভাবে সমস্ত ঘটনাকে নিজের মতো করে উল্টো করে দেয় তার ছবি দেখি। এখানে সত্যকে বিকৃত করার নগ্ন ছবি শক্তিশালী লেখকের কলমে ফুটে উঠেছে। জরুরী অবস্থায়

লেখা এই গল্পে উঠে এসেছে কিভাবে ক্ষমতাবানেরা প্রত্যাশিত সুযোগ-সুবিধা পায় আইনের ফাঁকে। সাধারণ মানুষ অন্যায়ের শিকার হয়। কিভাবে শক্তিমানেরা সমস্ত ঘটনা নিজের পক্ষে নিয়ে নেয় তাও এখানে দেখা যায়। ম্যানেজার এখানে শক্তিশালী শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি। 'তীর' নামকরণটির মধ্য দিয়ে প্রশাসনের ন্যায় বিচারের প্রহসনটি এখানে প্রতীক হয়ে উঠেছে। লেখক এই গল্পে সমস্ত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চেয়েছেন।

ত্রিপুরার আদিবাসী জনজাতির সমস্যা ও কুসংস্কারকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ পরিণাম বর্ণিত হয়েছে বিমল চৌধুরীর 'জাগরণ' গল্পে। গল্পকার এখানে ত্রিপুরার উপজাতিদের জীবন সমস্যার কেন্দ্রে আঘাত করে সমকালীন বাস্তব মণ্ডিত জীবন চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'জাগরণ' গল্পটি ত্রিপুরার ছোটগল্পে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। উপজাতি সমাজের কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে, তারা ধরে নেয় যে এই ব্যাধি কোন অপদেবতার সৃষ্টি। তখন ওঝা আসে, আরোগ্যের জন্য সেই দেবতার উদ্দেশ্যে শূকর, হাঁস, মোরগ, মদ, মাংস ইত্যাদি পূজার সামগ্রী নিবেদন করা হয়। কিন্তু দেবতার সাধ্য নয় ব্যাধি থেকে মুক্তি ঘটানো। ফলে উপজাতিদের জীবনের নিদারুণ অজ্ঞতাই জয়ী হয়। বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু ঘটে। কালিগাই ত্রিপুরা গল্পের নায়ক নগুরাইয়ের পিতা। নগুরাই আগরতলা শহরে গিয়ে দেখে এসেছে সেখানে চিকিৎসার সুব্যবস্থা। তাই পিতা কালিগাইয়ের সংকটজনক পরিস্থিতিতে ওঝা ডেকে প্রহসন সৃষ্ঠিকে সে বুঝতে পারে। লেখক এখানে প্রতিটি কথার মধ্য দিয়ে উপজাতিদের সমস্যাগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

জুমকে কেন্দ্র করেই তাদের সংস্কৃতি, আনন্দ-বিনোদন, তাদের জীবন ধারনের সমস্ত কিছু আবর্তিত হয়। কালিগাইয়ের পরিবার জুম চাষের উপরই নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু টানা কয়েক বছর জুম করলে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। ফলে তাদের নতুন টিলার সন্ধান করতে হয়। এইভাবেই নগুরাইয়ের ভাই বিশরাইকে বন্যপশুর হাতে প্রাণ দিতে হয়। লেখকের ভাষায়- 'বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য চাই। খাদ্য ফলাবার জন্য সারবান নতুন জুম টিলা চাই, তার জন্য নিরস্ত্র অবস্থায় বুনো পশুর ধারালো দাঁতে নিজেদের অসহায়ভাবে সঁপে।'[৯] চিকিৎসার অভাবে নগুরাইয়ের ছোট বোন কুকুই মারা যায়। পাহাড়ের অসুবিধাগুলি বুঝতে পেরেছে নগুরাই। 'এভাবে বছরের পর বছর ঘুরে কতো টিলা পাওয়া যাবে! নিরস্ত্র অবস্থায় কতো জীবন দিতে হবে! ফসল না ফললে না খেয়ে, আধি-ব্যাধিতে বিনা চিকিৎসায় ভুগে মরে, কতো পাহাড়ী মানুষ অবশিষ্ট থাকবে।'[১০] নগুরাইয়ের ভাবনায় পাহাড়ি মানুষের জীবনযাত্রা ও অস্থিত্বের সংকট ফুটে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের মূল ভূখণ্ডের মানুষজনের কাছে অপরিচিত উপাদানে তৈরি এই গল্প শুধু গল্পকথা নয়। সমগ্র পাহাড়ি মানুষের জীবনকথা। পাহাড়ের আদিবাসীদের আর্থসামাজিক জীবনচিত্র, অশিক্ষা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষের কঠিন জীবন সংগ্রাম এখানে স্পষ্ট। নগুরাই আগরতলা গিয়ে দেখেছে তাদের রাজা তাদেরই মত উপজাতি হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। আর কালিগাইয়ের মতো মানুষ এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাদের চিকিৎসা সঠিকভাবে হয় না। তাই তাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে নিশ্চিত মৃত্যু। গল্পের শেষে নগুরাই তার পিতার মৃতদেহ আগলে রেখে ভাবে সমস্ত প্রথা, সমস্ত রকম শোষণ-বঞ্চনা থেকে পার্বত্য উপজাতিদের মুক্তি পেতেই হবে। গল্পের সমাপ্তিতে নগুরাই-এর কণ্ঠে একটি দৃপ্ত শপথ উচ্চারিত হয়। 'আমরা সব পাহাড়িয়া এক।'[১১]

পার্বতী ত্রিপুরার ভূমিপুত্রদের দুর্দশার কাহিনি লেখকের গভীর সহানুভূতি পেয়েছে। একই জাতির মানুষজনদের মধ্যে শহরবাসী আর পাহাড়ির আর পাহাড়ির দুস্তর ব্যবধান-এই সবকিছুই এখানে একেবারে বাস্তবের মাটি থেকে উঠে এসেছে। রাজন্য শাসনাধীন ত্রিপুরায় বাস করে সর্বশক্তিমান রাজা এবং রাজ পারিষদ ও কর্মচারীদের সমালোচনা করার যে দুঃসাহস নগুরাই দেখিয়েছে তা গল্পকারেরই সাহসিকতার ছবি। নগুরাইয়ের জাগরণ সমগ্র আদিবাসী পাহাড়িয়া মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করে। ত্রিপুরার মাটি নিজস্ব বৈশিষ্ঠ্য নিয়ে গল্পটিতে ফুটে উঠেছে।

সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন সংগ্রাম ও অসহায়তার চিত্র একটি গ্রহণকে কেন্দ্র করে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার মানিক চক্রবর্তী তাঁর 'গ্রহণ কেটে গেলে' গল্পে। গল্পকার এখানে গ্রহণের সঙ্গে দরিদ্র পরিবারের জীবন সংগ্রামকে মিলিয়ে দিয়েছেন। গ্রহণ যে সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারের রোজগারে কি প্রভাব ফেলে তার চিত্রও এখানে আছে। গল্পটি আবর্তিত হয়েছে রিক্সা চালক কৃপাসিন্ধুকে কেন্দ্র করে। রিক্সাওয়ালাদের জীবনী শক্তি নিংড়ে নেয় রিক্সাচালানো। তাই কৃপাসিন্ধু অসুস্থ। অত্যধিক পরিশ্রম তার শরীরের উপর বড় রকমের থাবা বসায়। তাই সংসার চালানোর ভার স্ত্রী পার্বতী সহ ভাগ করে নেয়। অসুস্থ অবস্থায় তাদের একমাত্র অবলম্বন পার্বতীর ডাক্তারের ঘরে কাজ করা টাকা ও অনেক সাধ্য সাধনা করে আনা রেশনের চাল। সে নিজের শারীরিক অবস্থায় স্ত্রী ও কন্যার জন্য চিন্তিত। ছেঁড়া চাদর গায়ে দেবার প্রসঙ্গে লেখক স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের গাঢ়তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভাঙাচোরা শরীরটাকে এখন তার জীপ গাড়ির ইঞ্জিনের মতোই বিকল মনে হচ্ছে। যৌবনে সে অনেক জোর দিয়ে রিক্সা চালিয়েছে। পুরানো সব কিছু তার মনে পরছে। সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন অর্থহীন হয়ে গেছে। এখন তার সঙ্গীরাও কেউ নেই। এই দুরাবস্থা তার একার নয়, সে সমস্ত গরীব শ্রমজীবী পরিবারের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। প্রতি মুহুর্তেই তার যন্ত্রণা রয়েছে। এক মুঠো অন্নের জন্য শরীরের সমস্ত যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে কাজে বেরুতে হচ্ছে। ক্ষুধার্ত কৃপাসিন্ধু রাস্তায় বেরিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান মঞ্চ আয়োজিত গ্রহণ সম্পর্কে সচেতনতা শিবিরে যায়। সেখানে গ্রহণের দৃশ্য দেখে ভাবে- 'কী অপূর্ব দৃশ্য। একে একে সূর্য অন্ধকারে ঢাকা পড়ছে। এক সময়ে একটা রিঙের মতো মনে হল। রিক্সার চাকার রিঙটার মতো, তবে ভীষণ সুন্দর।'[১২] এখানে লেখক জীবনের প্রকৃত বাস্তবকে তুলে ধরেছেন। কৃপাসিন্ধুর প্রত্যক্ষ বাস্তব হল ক্ষুধা। তার অন্ন সংস্থান করে এই রিক্সা। সূর্যকে তার রিক্সার চাকার মতোই মনে হয়। এখানে সবকিছুর মধ্য দিয়ে লেখক তার অসহায়ত্বটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

জীবন সংগ্রামের এই কঠিন রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে সে হারতে চায় না। তাই সে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়। জীবন যুদ্ধে স্ত্রী ও সন্তানের জন্য তাকে সংস্থান করতে হবে। তাই বাঁচার তাগিদে সারাদিনের যন্ত্রণাকে ঝেড়ে ফেলে আবার নতুন করে চলতে চায়। গল্পের শেষে দেখা যায় খিচুরি মুখে পুরে পার্বতী বলছে- ' শুনছনি। পাইবা, পেসেঞ্জার পাইবা। অখন আর গরনের আর ডর নাই। সামনের বছর হগলেই কামে যাইব।'[১৩] এ কথাটা সমস্ত গল্পটিতে একটি আশার ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে দিয়েছে। এখানে শুধু সূর্যগ্রহণ নয়, গরীব দম্পত্তির সামর্থ্যের প্রতিটি বিন্দু দিয়ে কিভাবে পরস্পরের সহযোগী হয়ে জীবনের অন্ধকারকে দূর করে তার চিত্র পাই। বহুকষ্টেও এখন পার্বতীর মধ্যে দুঃখ ও শূণ্যতাকে জয় করার মানসিকতা দেখা যায়। স্বামীকে সে যথার্থ সহধর্মিনীর মতোই আশার বাণী শোনায়। এই দুঃখযন্ত্রনায় ভরা দৈনন্দিন জীবনেও অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। দুঃখ, দারিদ্রে তাদের ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। মেয়েকে স্কুলে পাঠানোর ভাবনার মধ্য দিয়ে সদর্থক ভাবনা ফুটে উঠেছে। মানুষের জীবনে গ্রহণের মতোই দুঃখ কেটে গিয়ে একদিন সুখ আসে। তাই স্তব্দ না থেকে বাঁধা অতিক্রম করে চলার মধ্যেই মনুষ্যত্বের পরিচয়। এখানে গল্পকার একটি সদর্থক ভাবনার মধ্য দিয়ে গল্পের সমাপ্তি করেছেন।

গল্পকার ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য 'বুড়া দেবতার মাচাং' গল্পে ত্রিপুরার উপজাতিদের অবহেলিত জীবনকথা রূপায়ণে একটি সার্থক ভূমিকার পরিচয় দিতে পেরেছেন। এই গল্পের শত্রুঘ্ন আদিবাসীদের চিরাচরিত প্রথায় জুম চাষের মাধ্যমেই জীবন-জীবিকা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু উন্নয়নের অগ্রদূত সরকারী বাবুরা ক্রমশই পাহাড়ি এলাকাতেও ঢুকে পড়েন। পীচ বাঁধানো রাস্তা তৈরি হয়, সমস্ত বন কেটে বসত এগিয়ে আসে, আবার কোন বন 'রিজার্ভ' চিহ্নিত হয়ে যায়। 'সব জায়গা যদি রিজার্ভ হয়ে যায় তবে আমরা জুম করব কোথায়।'[১৪]- এই প্রশ্ন বুকের ভেতর দাবিয়ে রেখেই শত্রুঘ্নরা ক্রমশ আরো গভীর অরণ্যে সরে যেতে থাকে। বেঁচে থাকার সংগ্রাম কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠে। দরিদ্র উপজাতিদের জীবন-যাপনের ন্যূনতম অবস্থান এই মাচাং। এরই মধ্যে বহু কষ্টে দিন কাটাচ্ছে শত্রুঘ্ন। শত্রুঘ্ন বুঝতে পারে যে এইসব মানুষ সাধারণদের উন্নতি করতে আসেনি। 'সেই প্রথম যেদিন গাড়ি ভর্তি সরকারী বাবু এসেছিল, শত্রুঘ্নের স্পষ্ট মনে আছে সেদিন তার হাতের টাক্কালটা যেন একবার রক্তের তৃষ্ণায় পাগল হয়ে উঠেছিল।'[১৫] এখানে শোষণের ফলে উপজাতিদের মনের চাপা ক্ষোভ, উত্তেজনা ও অস্থিরতার চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শত্রুঘ্নের এখনকার অসহায়তার পেছনে রয়েছে বাঁচার একমাত্র আশ্রয় মাচাংটি ভেঙ্গে যাচ্ছে, সঙ্গে রয়েছে তার ক্ষুধা। সরকারী তত্ত্বাবধানে যত ফরেস্ট তৈরি হচ্ছে ততই একটির পর একটি জুমের টিলা তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ফলে উপজাতিদের অন্ন সমস্যা দিন দিন বেড়ে চলে। এই সমস্যা সমাধানের সূত্র হিসাবেই মঙ্গলাকে শহরে মানুষ গড়ার কারখানায় পাঠিয়েছিল। মঙ্গলাকে যে আদিবাসী জীবনের অংশীদার হিসাবে দেখতে চায় না।

শত্রুঘ্ন চায় ছেলে রাজা বাবুদের স্কুলে পড়ে বড়ো হবে, বাপের মতো পাহাড়ি জুমিয়ার কষ্টের জীবন তার নিয়তি হবে না, বাপের মতো পাহাড়ি জুমিয়ার কষ্ঠের জীবন তার নিয়তি হবে না। এই আশায় যথাসাধ্য টাকা পয়সা মঙ্গলাকে দিয়েছে সে, কিন্তু বছর খানেক আগে একবার টাকা চাইতে মঙ্গলা পাহাড়ে এলে বাপ বলে- 'টিলায় আর টাকা নাই। কোত্থেকে টাকা দেবো। জুম নাই, চাষ নাই। তিল ধান নাই, বাঁশ কাটলে আগাম পয়সা, টিলাই বা কোথায়? সব লোকে গিজ গিজ।'[১৬] তারপর আর আসেনি মঙ্গলা। শহর শত্রুঘ্নর ছেলেকে গ্রাস করে নিয়েছে। সভ্য নাগরিক জীবনে অভ্যস্থ হয়ে যাওয়া মঙ্গলা আর কোনদিন টিলায় ফিরবে না- এমনকি বুড়ো বাপকে দেখতেও না। জুম চাষের টিলা নেই, শরীর অশক্ত, ছেলে দূরে সরে গেছে- শত্রুঘ্নর মাথার মধ্যে সব যন্ত্রণাগুলো কেমন যেন জট পাকিয়ে যায়। সে উপজাতিদের সমস্ত জুমিয়ার প্রতিনিধি। এ গল্পের ভেতর দিয়ে লেখক সাধারণ আদিবাসীদের সমব্যাথী হয়ে তাদের মুখে ভাষা দিয়েছেন। বিশেষত লেখকের মমতা গল্পটিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। পুঁজিবাদের আবির্ভাবের ফলে উপজাতিদের যৌথ ও সাম্যবাদী জীবনযাত্রা কিভাবে ভেঙ্গে পড়েছে এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের উদ্ভবের ফলে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে ছোট ছোট পরিবার গড়ে উঠেছে- এই সমস্যার চেয়ে লেখক ব্যক্তি শত্রুঘ্নের সমস্যাকে এখানে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ত্রিপুরার ছোটগল্পকার সমকালীন বাস্তব প্রেক্ষাপটে জাতি-উপজাতি দলিত ও নিপীড়িত মানুষের জীবন্ত সমস্যাগুলিকে অত্যন্ত বাস্তবোচিতভাবে তুলে ধরেছেন।

মানস দেববর্মণের 'সীমানা' গল্পের মনমোহন গ্রামের মহাজন কানাই পালের লোভের গ্রাস থেকে সামান্য চাষের জমিটুকু বাঁচিয়ে রাখতে প্রাণপণ চেষ্ঠা করে। প্রাণ বাঁচাতে মা শুভচণ্ডীর মূর্তি নিয়ে ভিক্ষা করে। স্ত্রী পুত্রদের প্রাণ বাঁচাতেই তার এই ছলনা। সেই মহাজনের বাড়িতেই বুভুক্ষু মানুষের সঙ্গে খিচুড়ি খেতে গিয়ে এক অদ্ভুদ অভিজ্ঞতার শিকার হতে হয়। পেটের ক্ষিদে মেটানোর জন্য মানুষকে যে কতো রকমের ছলনার আশ্রয় নিতে হয় তার প্রকাশ দেখা যায় মানস দেববর্মণের 'শিব ঠাকুরের দয়া' গল্পে।

ত্রিপুরার বাংলা ছোটগল্পে নিম্নবিত্তদের জীবনযাপনের অনুপুঙ্খ বিবরণ বিবরণ দিয়েছেন ত্রিপুরার সৃজনধর্মী শিল্পী সাহিত্যিকগণ। তাঁদের রচনায় উঠে এসেছে সমাজের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার ছবি। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তাদের প্রতিদিনকার যন্ত্রণাময় চিরপরিচিত ছবি এই সব ছোটগল্পে উঠে এসেছে।

উল্লেখপঞ্জিঃ

১। বিশ্বাস, নীতীশ, দলিত সাহিত্য, ঐকতান গবেষণা সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ-৩৪

২। দাশ, নির্মল ও দত্ত, রমাপ্রসাদ সম্পাদিত, *শতাব্দীর ত্রিপুরা,* অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০৫, পৃ- ২০০

৩। পোদ্দার, নিলিপ সম্পাদিত, সত্তর দশকের নির্বাচিত গল্প, পৌণমী প্রকাশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১৪, পৃ-৬০
৪। প্রাগুক্ত, পৃ-৬০
৫। প্রাগুক্ত, পৃ-৬০
৬। প্রাগুক্ত, পৃ-৬১
৭। ঘোষ, দুলাল, বিংশ শতকের ত্রিপুরার শ্রেষ্ঠ বাংলা গল্প, সৈকত প্রকাশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, ২০০১, পৃ-৫৭
৮। প্রাগুক্ত, পৃ-৫৭
৯। চৌধুরী, বিমল, মানুষের চন্দ্রবিজয় ও তারানাথ, পৌনমী প্রকাশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, পৃ-৪
১০। প্রাগুক্ত, পৃ-৪
১১। প্রাগুক্ত, পৃ-৬
১২। পোদ্দার, নিলিপ সম্পাদিত, সত্তর দশকের নির্বাচিত গল্প, পৌণমী প্রকাশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১৪, পৃ-১২১
১৩। প্রাগুক্ত, পৃ-১২৩
১৪। ভট্টাচার্য, ভীষ্মদেব, নির্বাচিত ভীষ্মদেব, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ-২৫
১৫। প্রাগুক্ত, পৃ- ২৪-২৫
১৬। প্রাগুক্ত, পৃ- ২৬

সহায়ক গ্রন্থঃ

১। পোদ্দার, নিলিপ (সম্পাদনা), সময়ের দাগঃ ত্রিপুরার গল্পে, পৌনমী প্রকাশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ১৯৯৮
২। পুরকায়স্থ , রণবীর, তৃতীয় ভুবনের রূপকথা, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, প্রথম সংস্করনঃ বইমেলা। ২০১১
৩। চৌধুরী, বিমল, মানুষের চন্দ্রবিজয় এবং তারানাথ, পৌনমী প্রকাশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ১৯৭৩
৪। দাশ, নির্মল ও দত্ত, রমাপ্রসাদ সম্পাদিত, *শতাব্দীর ত্রিপুরা*, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০৫
৫। দেব, শুভব্রত (প্রকাশক), *নির্বাচিত ভীষ্মদেব*, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ১৯৯৭
৬। দাশ, নির্মল, উত্তরপূর্বের বাঙলা ছোটগল্প বীক্ষনঃ এক (পর্বঃত্রিপুরা), অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১২
৭। বিশ্বাস, মনোহর, শতবর্ষের বাঙলা দলিত সাহিত্য, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, কলকাতা বইমেলা, ২৬ জানুয়ারি ২০১১
৮। বিশ্বাস, নীতীশ, দলিত সাহিত্য, ঐক্যতান গবেষণা সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮
৯। পোদ্দার, নিলিপ সম্পাদিত, সত্তর দশকের নির্বাচিত গল্প, পৌণমী প্রকাশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১৪

***